নারী নির্যাতন

প্রতিরোধে চাই গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র

নারীনির্যাতন প্রতিরোধে চাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন

সিলেটে স্বামীর সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিল এক তরুণী। এমসি কলেজের সামনে গাড়িতে বসে গল্প করার সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাদের ঘিরে ধরে। স্বামীকে আটকে রেখে ওই তরুণীকে কলেজের ছাত্রাবাসে নিয়ে গণধর্ষণ করে। এর দিন কয়েক আগেই খাগড়াছড়িতে এক আদিবাসী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তরুণীকে বাঙালি সেটেলাররা গণধর্ষণ করে। ঢাকার সাভারে নীলা রায় নামে এক নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল এক বখাটে যুবক। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কুষ্টিয়ার মিরপুরে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে মাদ্রাসা সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চতুর্থ শ্রেণীর এক মাদ্রাসা ছাত্রকে ধর্ষণ করে এক মাদ্রাসা শিক্ষক। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এরকম শত শত ধর্ষণ-গণধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। দেশ যেন ধর্ষকদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। পত্রিকায় ঘটনাগুলো সামনে আসার পর দেশের বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছে। কোথাও কোথাও হয়েছে প্রতিবাদ।

এর মধ্যেই ৪ অক্টোবর ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে যুবলীগের দেলোয়ার বাহিনী কর্তৃক এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও চিত্র। ঘটনা আরও এক মাস পূর্বের। কিন্তু এর মধ্যে পুলিশ তার হদিস পায়নি। গ্রামবাসীরা নির্যাতকদের ক্ষমতার দাপটের কারণে প্রতিবাদ করেনি। ভিক্টিমও ভয়ে মুখ খোলেনি। অভাবিত এই ঘটনায় দেশের মানুষ স্তম্ভিত – হতবাক! লাঞ্ছিত অপমানিত এক নারীর আর্তনাদ – 'বাবা গো, তো গো আল্লার দোহাই লাগি, ছাড়ি দে'। বাবা ডেকে, আল্লার দোহাই দিয়েও নির্যাতকদের মন গলাতে পারেননি ওই নারী। কিন্তু এই আর্তনাদের ধ্বনি মানুষের কানে কানে পৌঁছে গিয়েছে। তাই সারাদেশে ঝড় উঠেছে প্রতিবাদের। ছাত্র-নারীসহ সমাজের সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষেরর হৃদয় কেঁপে উঠেছে যেন – এই সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষকে ধীরে ধীরে কোন অতলে নিয়ে যাচ্ছে দেশের শাসকরা? ঘরে-বাইরে-কর্মক্ষেত্রে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি ধর্মীয় উপাসনালয়ে – কোথাও নারী নিরাপত্তা নেই, মর্যাদা নেই। ধর্ষণ-নির্যাতনের কতটুকু খবর আর আসে পত্রিকায়? দু'একটি ঘটনায় হয়তে আলোড়ন উঠে – আবার হারিয়ে যায়। বরং দিন দিন ঘটনার ব্যাপকতা, মাত্রা, বীভৎসতা যেন আরও বাড়ছে। একটি নির্যাতনের বীভৎসতা, নৃশংসতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আরেকটিকে। ধর্ষণ-নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? এর শেষ কোথায়? অনেক প্রতিবাদ আন্দোলনের পরও অনেকে প্রশ্ন তুলে – মেয়েটির পোশাক পরিচ্ছদ ঠিক ছিলো তো? বুঝে হোক না বুঝে হোক, ধর্ষক-নির্যাতকদের রক্ষাকারী এমন যুক্তির আড়ালে আমরা ভুলে যাই, এই ঘটনাগুলোর মূল কারণ কি। প্রতিকারের দায়িত্ব যাদের, তাদের ভূমিকা মূল কারণকে যেমন আড়াল করে, তেমনি অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়।

বিচারহীনতার কারণে বাড়ছে ধর্ষণ-নির্যাতন

চলতি বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯৪৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪১ জন নারীকে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ৯জন। আর ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন ১৯২ জন। ২০১৮ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন ৭৩২ জন। আর ২০১9 সালে ধর্ষিত হয়েছেন ১৪১৩ জন। অর্থাৎ বছরের প্রথম নয় মাসেই ধর্ষণের সংখ্যা ২০১৮ সালকে ছাড়িয়ে গেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণের সংখ্যা আরও বেশি। কারণ সব ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না বা থানা পর্যন্ত যায় না। প্রতিবছরই এই যে ধর্ষণ বাড়ছে তার কারণ কী? বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেকোনো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে

আইনের প্রয়োগ জরুরি। কিন্তু দেশের আইনে ধর্ষণ ফৌজদারি অপরাধ হলেও এটি প্রায় অকার্যকর। এর প্রয়োগ বা বিচার নেই বললেই চলে।

২০১৬ সালের ২০ মার্চ কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এই ঘটনার ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেফতার হয়নি। তদন্ত রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি। ২০১৭ সালের মার্চে বনানীর রেইনট্রি হোটেলে আমিন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে কর্তৃক ধর্ষণের বিচার হয়নি। শিল্পপতি লতিফুর রহমানের মেয়ে শাজনীন তাসনিম রহমান ধর্ষণ ও হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় পেতে লেগেছে ১৮ বছর। এথেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষ কতটুকু বিচার পায়। কখনো সখনো নিম্ন আদালতে রায় হলেও উচ্চ আদালতে রায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এমনিতেই নানান সামাজিক বিধি নিষেধ, হেনস্তার ভয়ে অনেক ঘটনা সামনে আসে না, মামলা পর্যন্ত হয় না। আবার যে মামলাগুলো হয় তার বিচার হয় না। ধর্ষণের মামলার মাত্র ৩শতাংশের শাস্তি হয়, বাকি ৯৭ শতাংশেরই কোনো বিচার হয় না বা খালাস পেয়ে যায়। ফলে ধর্ষণের ঘটনার বিচারহীনতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে, ধর্ষণ-নির্যাতন বাড়ছে। বিচারহীনতার কারণে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ধর্ষকের ফাঁসির দাবি করছেন। ঘটনাগুলোর বিচার অবশ্যই হওয়া দরকার। বিচার করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে হবে। তাহলে অবশ্যই ধর্ষণ-নির্যাতনের মাত্রা কমবে। কিন্তু যেখানে বিচারই হয় না সেখানে ফাঁসির আইন পাশ করলেই কী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? বরঞ্চ অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এর ফলে ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড আরো বেড়ে যাবে।

ফ্যাসিবাদী শাসন ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ধর্ষকদের পৃষ্ঠপোষক

বিচারহীনতার কারণে ধর্ষণ-নির্যাতন বাড়ছে একথা যেমন সত্য তেমনি বিচারহীনতার বড় একটি কারণ এই ঘটনা গুলোর সাথে অধিকাংশ সময় জড়িত থাকে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও তাদের দোসররা। সাম্প্রতিক কয়েকটি আলোচিত ঘটনার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। যেমন এমসি কলেজে গণধর্ষণ বা নোয়াখালীতে নারীকে বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করার ঘটনায়ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ যুক্ত। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ভোট ডাকাতির মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হয় সেই সময় এই নোয়াখালীতেই নৌকা মার্কায় ভোট না দেয়ায় চার সন্তানের জননী এক নারীকে গণধর্ষণ করেছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ফলে দেখাই যাচ্ছে, ধর্ষণ-গণধর্ষণের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পুলিশ স্টাফ কলেজের গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ধর্ষকদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে ১৪.৯ শতাংশ ধনিক শ্রেণীর সন্তান, ৯.১ শতাংশ রাজনীতিবিদদের সন্তান/আত্মীয় এবং ৪.৬ শতাংশ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। ফলে ধর্ষণ কেবল বিকৃত যৌন বাসনা নয়, ক্ষমতার প্রকাশ। এই ক্ষমতার মধ্যে রাজনৈতিক ও বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্যমূলক মনোভাব – দুটোই জড়িত।

আজ যে সমাজে প্রতিদিন ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে তা কি এমনি এমনি ঘটছে? স্বাধীনতার আগে তো এমন পরিস্থিতি ছিল না। এ ধর্ষকরা কারা? তিন বছরের শিশু কন্যা থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা নারী যে কাউকে ধর্ষণে তাদের বিবেক এতটুকু কেঁপে ওঠে না কেন? এরা কি জন্ম থেকেই ধর্ষক? এদের তৈরি করছে কে? যাদের হাতে সমাজের ভার, শাসনের ভার তারা কি দায়ী নয়? দেশের সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া, নারীর নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু নিরাপত্তা তো দিতে পারছেই না উল্টো সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর বক্তব্যে বোঝা যায়, তারা এর দায়িত্ব অস্বীকার করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখেন কোন জায়গায় ধর্ষণ নেই? এমন কোনও দেশ নেই ধর্ষণ হয় না!' আরেক মন্ত্রী বলেছেন, ধর্ষণের ঘটনা আগেও ঘটেছে। এখন গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছে বেশি। নোয়াখালীর নির্যাতিত নারীর ভিডিও চিত্র ভাইরাল হওয়ার পর আইনমন্ত্রী বলেছেন, এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে। সারাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে যে ঘটনা এমন ধিক্কারযোগ্য, দায়িত্বশীলদের (!) বক্তব্যে তার কোনো সংবেদনশীল প্রকাশ আছে কি? কিংবা দায়িত্বপূর্ণ মানসিকতার প্রকাশ? এভাবে দায়হীন ভাষ্য এবং এর

পেছনের মানসিকতা অপরাধ নির্মূলের পরিবর্তে বারবার ঘটনার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তো মনে হয় অন্য দেশে আছে বলে এই দেশেও ধর্ষণ-নির্যাতন তাই ন্যায্য ও যৌক্তিক! ফলে বিচার করার কি আছে? এরকম বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কার্যত সরকার অপরাধের গুরুত্বকে লঘু করছে, নারীর নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্বকে অস্বীকার করছেন। এর মধ্য দিয়ে তারা ধর্ষকদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছে। শুধু পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষভাবেও রাজনৈতিক ক্ষমতার আশ্রয়-প্রশয়েই ধর্ষকরা লালিত পালিত হয়। বিনা ভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এদের লালন করছে। ধর্ষণসহ সমস্ত অপরাধ করার লাইসেন্স দিয়েছে। অন্যদিকে মাদক, পর্ণোগ্রাফির বিস্তার ঘটিয়ে এমন একদল মানুষ তৈরি করছে যাদের মধ্যে ন্যূনতম বোধ, মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব নেই। যাদের শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষার প্রয়োজনে, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বিক্ষোভ-আন্দোলন দমনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি মজুদ বাহিনী হিসেবে কাজে লাগানো হয়। জনগণের বিভিন্ন আন্দোলম দমনে এদেরই হেলমেট-হাতুড়ি বাহিনীর ভূমিকায় দেখা যায়।

আসলে এই ব্যবস্থার চালকের আসনে আজ যারা বসে আছে তারা জানে, যুবকদের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে না পারলে, বিবেকহীন অমানুষ বানাতে না পারলে শোষণ-লুটপাটের এ ব্যবস্থার ভিত্তি টিকবে না। তারা চায় যুবকরা মদ-গাঁজায় ডুবে থাকুক, বিবেকবর্জিত নোংরা আনন্দে মেতে থাকুক। কেননা কোটি কোটি বেকার যুবকের যদি নৈতিক মেরুদণ্ড থাকে, আদর্শ থাকে, সংবেদনশীল মন থাকে, মানবিক মূল্যবোধ থাকে, তাহলে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। যুবকরা নোংরা পর্নো সিনেমা দেখুক, প্রবৃত্তিতাড়িত বিকারে ডুবে যাক–এটাই তাদের চাওয়া। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, মানুষকে পশুর স্তরে না নামালে তাকে দিয়ে পশুর কাজ করানো যায় না।' এভাবে এই অধঃপতিত রাজনীতি সমাজে প্রতিনিয়ত ক্রিমিনালের জন্ম দিচ্ছে। যুক্তিবাদী মননের বদলে এই সমাজ মানুষকে বানাচ্ছে মেশিন।

একদিন নারী স্বাধীনতার কথা বলেছিল পুঁজিবাদ আজ নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে

আমরা জানি, একদিন নারীরা ছিল গৃহবন্দি। তাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোনো মর্যাদা ছিল না। ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা তাদের পদে পদে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তনের কালে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান উচ্চারিত হলো। নারীদের সম্পর্কে পুরোনো অনেক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যাপক বিকাশের ফলে নারীদের ঘর থেকে বের করতে হলো, ধর্মের বিধি-নিষেধ অনেক আলগা হয়ে গেল। নারী শ্রমিকরা লড়াই করে অর্জন করেছিল তাদের ভোটাধিকার, সমকাজে সম-মজুরির দাবি তুলেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই অবস্থা বজায় রাখতে পারল না। ক্রমে একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হলো, ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফা নিশ্চিত করতে গিয়ে সামাজিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে জন্ম দিল নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এখন পুঁজিবাদের আদর্শ হয়েছে 'খাও দাও স্ফূর্তি কর।' নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে এমনকি সাহিত্যে সর্বত্র ভোগবাদের জয়গান। নারীকে নগ্ন, অর্ধনগ্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের বইয়ে এটা এখন স্বীকৃত তত্ত্ব যে, পণ্য বিক্রির জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ও অব্যর্থ marketing policy হলো যদি পণ্যের সাথে sex appeal ভোক্তার সামনে রাখা যায়। তাই সাবান, তেল, শেভিং ক্রীম বা পারফিউম যাই হোক না কেন, সেটি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপনে তার সাথে উপস্থাপিত হয় আরেকটি পণ্য – নারীদেহ। খেলার সৌন্দর্য্য আজ তাই আর যথেষ্ট নয়, দর্শক মাতাতে আমদানি করা হয়েছে স্বল্পবসনা চিয়ার্স গার্লদের। এভাবে দেখতে দেখতে মানুষ হিসেবে নারীর প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। এ সমাজে যুবক-তরুণদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ নেই জন্মের পর থেকে পদে পদে একজন মেয়েকে যেমন সবকিছু মানিয়ে চলতে শেখানো হয়, ঠিক তেমনি একজন পুরুষকেও প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় গড়ে তোলা হয়। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাতেও একজন মানুষকে কূপমণ্ডূক-পশ্চাৎপদ চিন্তা ও বৈষম্যের মানসিকতা থেকে বের করার আয়োজন নেই। তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় (মাদ্রাসা, বাংলা, ইংরেজি) বৈষম্যকে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা আর ইংরেজি মাধ্যমের একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসিকতা-

সংস্কৃতি-আর্থিক সামর্থ্যের বিশাল পার্থক্য তৈরি হয়ে আছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ছাত্রের কোনো সুযোগই থাকে না গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে নারীকে দেখার। বাচ্চাদের শেখানো হয়, পুরুষের প্রয়োজনেই নারীর সৃষ্টি, স্ত্রী হলো স্বামীর শস্যক্ষেত্র, স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত, নারীর কাজ ঘর সামলানো-সন্তান উৎপাদন করা, নারী-পুরুষের একসাথে মেলামেশা-চলাফেরা করা উচিৎ নয় তাতে ব্যভিচার জন্ম নিতে পারে, নারী নেতৃত্ব হারাম ইত্যাদি। মূলধারার শিক্ষাতেও আমরা অংক করতে করতে বড় হই – 'একটি কাজ দুইজন পুরুষ করে চার দিনে, আর চারজন নারী করে চার দিনে। কাজেই একজন পুরুষ = দুইজন নারী।' মেয়েদেরকে অধিকাংশ স্কুলে পড়ানো হয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি আর ছেলেদের কৃষিশিক্ষা। ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, মেয়েদের কাজ কোনটা আর ছেলেদের কোনটা। পড়াশুনার ধরন এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, খেলাধুলাসহ নানা বিষয়ের উপর বইপড়া এসব অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। খেলার মাঠ বেদখলে। গানের নামে চলছে উচ্চলয় আর যন্ত্রের শব্দের মাঝে প্রবেশ করানো অশ্লীল শব্দ ও হালকা কথাবার্তার পরিবেশনা। শিশু-কিশোররা এগুলোই শুনছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো আছে সাইবার ক্যাফে আর ভিডিও গেমসের দোকান। মোবাইলে পর্নোগ্রাফি এখন হাতের মুঠোয়। একদিকে চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্যদিকে ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে বড় হয়ে উঠছে আমাদের ভাই- বোনেরা। মাদকদ্রব্য তো অলি-গলিতেই মেলে। খোদ ঢাকা শহরে দৈনিক ১২ কোটি টাকার ইয়াবার ব্যবসা হয়। এসব জিনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেও পাওয়া যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একমাত্র কার্যকারিতা হচ্ছে চাকুরি পাবার এবং এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত করা। নীতি-আদর্শ এগুলো আজ সব কেতাবি বিষয়। ফলে নিজের স্বার্থসুবিধা, ভোগ আকাঙ্ক্ষাই যেখানে সর্বাগ্রে–সেখানে সুযোগ পেলে নারীকে নিপীড়ন করার মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাওয়া যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। পুঁজিপতিতরাও চাইছে, পণ্য বিক্রি করো, দরকার হলে প্রবৃত্তিকে উসকে দাও, অমানুষ করো, তাও পণ্য কেনাও। নারীর প্রতি বিকৃত রুচিহীন ভোগলিপ্সা এই আয়োজনগুলিরই ফলাফল। ফলে কোনো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিচার ও শাস্তি যেমন আমরা চাইবো, তেমনি রাষ্ট্রীয় মদদে তরুণদের চরিত্র নষ্ট করার এ সর্বগ্রাসী আয়োজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পরিবার ও প্রথাগত নিয়ম-কানুনের মধ্যেও নারীর সমান অধিকার নেই

নারীকে সমমর্যাদায় দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় হয়ে উঠার শিক্ষা এমনকি আমরা পরিবার থেকেও পাইনা। কেননা পরিবারও দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে পরিচালিত হয়। দেশের প্রচলিত ব্যবস্থা যেহেতু শোষণমূলক, দুর্বলের উপর সবলের নিয়ন্ত্রণ – পরিবারেও তেমনি পুরুষের দ্বারা নারীরা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্মীয় ও প্রচলিত নিয়ম-কানুনে সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা প্রধানত পুরুষের হাতে থাকে, নারীদের তাতে অধিকার নেই। 'নারী পুরুষের অর্ধেক' এই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে পরিবারগুলোতে খুব ছোটকাল থেকেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়া করতে থাকে। নারীরা পুরুষের অধঃস্তন - এই বোধ পারিবারিক-সামাজিকসাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে কাজ করে। সুতরাং পরিবারও নারীকে সমান মর্যাদা দেয়া কিংবা শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সাথে নারীকে গ্রহণ করার শিক্ষা আমাদের দেয় না। তাই পরিবারে নারীরা নানাভাবে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। সভ্যতা পত্তনের পর থেকে মানুষের সমাজব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে সত্যি কিন্তু শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। নারীর প্রতি সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি আসেনি যদিও সাম্যের কথা স্লোগানের অর্থে উচ্চারিত হয়েছে। ফলে সমাজের দুর্বল অংশ হিসেবে নারীরা সবসময়ই এই শোষণের শিকার হয়েছে।

ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব নারীদের মধ্যেও পড়ছে

প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের মানবিক গুণাবলীর পরিবর্তে দৈহিক সৌন্দর্য্যের যে দিকটিকে তুলে ধরতে চায়, বুঝে হোক না বুঝে হোক মেয়েরাও এর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এর কারণ ছোটবেলা থেকেই পরিবার ও চারপাশের পরিবেশে এ শিক্ষা তাকে দেয়া হয় না – মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের সাধনাই তার কর্তব্য; সকল সংস্কার ও

সামাজিক অবিচার বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোতেই তার মর্যাদার আসন। উল্টো বিজ্ঞাপন, সিনেমা, নাটকে প্রতিমুহূর্তেই শেখাচ্ছে– কিভাবে সিল্কি চুলে, রঙ্গিন সাজ পোশাকে, ত্বক ফর্সা করার প্রচেষ্টার মধ্যেই স্মার্ট হওয়ার রহস্য লুকিয়ে আছে। শিক্ষিত মেয়েরাও এই সংস্কৃতির শিকার। জীবনাদর্শে, মহত্ত্বে, মানবিক সৌন্দর্য্যে মডেল বা আদর্শ হবার উৎসাহ তাদের দেয়া হয় না বরং দেহের সৌন্দর্য্যে তাক লাগিয়ে ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্যই যতসব আয়োজন। এভাবে পুঁজিবাদ আজ নারীর মর্যাদাকে ভোগসর্বস্বতায় ভাসিয়ে দিয়ে বর্বর যৌন আক্রমণ নামিয়ে আনছে। আবার রক্ষণশীলরা এসব দেখিয়ে নারীকে ঘরে বন্দী রাখার চিরাচরিত ধ্বনি তুলছে।

ধর্মের নামে মৌলবাদীরা মেয়েদের ঘরে বন্দী রাখতে চায়

নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ব্যাখ্যা করেন ভিন্নভাবে। তারা বলেন, নারীরা ধর্ম মেনে চললে, পর্দা করলে এ পরিস্থিতি তৈরি হত না। আল্লামা শফী নারীদের নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'নারীরা তেতুলের মতো। নারীরা সামনে আসলে তো পুরুষদের লালা ঝরবেই।' যারা এমন যুক্তি করেন তারা কেউই নির্যাতকদের বা অপরাধীদের শাস্তির কথা বলেন না। মনোভাব এমন যে, নারীরা ঘরের বাইরে বেড়িয়েছে, তাই লাঞ্ছিত হলে দোষ তো তাদেরই। পুরুষের আবার দোষ কি? এ মতানুযায়ী, ২৩ মাসের শিশু ধর্ষণের কারণও শিশুটি নিজে! সম্প্রতি মোহাম্মদপুরের প্রিপারেটরি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণীর দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন করে স্কুলের কয়েকজন কর্মচারি। ধর্মব্যবসায়ীরা কি বলবেন এটাকে? অবুঝ ওই শিশুগুলো পর্দা করেনি বলে তাদের এই পরিণতি? প্রবৃত্তির উপর মানুষ যৌক্তিক-নৈতিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলেই অন্য প্রাণী থেকে সে আলাদা। মানুষের সমাজে যৌন সম্পর্ক ছাড়াও নারী-পুরুষের নানা-বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক থাকে। স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কগুলোর কথা যারা ভাবতে পারে না, কেবল যৌনতাকেই প্রধান মনে করে, তাদের রুচি-সংস্কৃতিবোধ আদিম এবং স্থুল। তাই বলা যায়, নারী নির্যাতনের কারণ কখনই পর্দা বা পোষাক নয়, এর কারণ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে দেখলে যার 'লালা ঝরে' সেটা তার মানসিক বিকৃতি। সেক্ষেত্রে সে কতটুকু স্বাভাবিকভাবে সমাজে চলবে, তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। বহু বছর আগে বেগম রেকেয়া এ প্রশ্নটি তুলেছিলেন যে, কোনো পশু যদি লোকালয়ে তাণ্ডব করে তাহলে করণীয় কি? মানুষদের বলা হবে ঘরে বন্দি থাকতে নাকি পশুকে খাঁচায় বন্দি করা হবে? নারী-পুরুষের সহাবস্থান, নারীকে কর্মক্ষেত্রে অধিকার দেয়া – সমাজের বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। যারা নারীকে উল্টো অবরুদ্ধ করার কথা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তারা সমস্যার সমাধান না করে সভ্যতার চাকাকে পিছনে ঘোরাতে চান। যা কখনই কাম্য হতে পারে না।

অথচ ইতিহাস বলে নারী চিরকাল অবরুদ্ধ ছিল না

ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখি যে, নারী ও পুরুষ সমান নয়। একথা সত্য যে, বর্তমানে বড় অংশের নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। কিন্তু যে সত্য প্রতিমূহুর্তে আড়াল করা হয় তা হলো, মানব সভ্যতার শুরুতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্যই ছিল না। সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এটা আজ প্রমাণিত সত্য। গুহা মানব-মানবীর প্রায় কাছাকাছি শারীরিক কাঠামো কিংবা শিকারে নর-নারীর সহাবস্থানের ছবি সেই প্রমাণই দেয়। নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতার কারণে নারীদেরই বরং সেই সময় এগিয়ে রাখা হত। আদিম সমাজে কৃষি, পশু পালন, পোষাক বুনন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নারীদেরই ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। মহান দার্শনিক ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দেখান যে, শুরুতে মানবসমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু সমাজে যখন স্থায়ী সম্পত্তি ও তার মালিকানা তৈরি হলো তখনই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা আসার পর পরিবার ও সম্পদের কর্তৃত্ব চলে গেল পুরুষের হাতে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে বংশধারা নিশ্চিত করতেই 'সতীত্ব' রক্ষার নামে নারীকে গৃহবন্দি করা হলো। পরবর্তীতে ধর্মীয় ও নানা সামাজিক বিধি-নিষেধের রূপে নারীদের উপর নানা নিয়মের শৃঙ্খল

আরোপিত হয়েছিল। হাজার হাজার বছরের পিছিয়ে পড়া অবস্থান নারীদের শারীরিক-মানসিক দিক থেকে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। নারীদের আজ শারীরিকভাবে খর্বাকৃতির বা দুর্বল ভাবা হয়। প্রাণীজগতের অন্যান্য অংশের মধ্যে লিঙ্গভেদে এতটা পার্থক্য হয় না, যতটা মানুষের সমাজে হয়েছে। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, বহুবছর ধরে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখাই নর-নারীর শক্তির পার্থক্যের কারণ। তবে সমাজের সকল বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিতসহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের এখন অগ্রণী অবস্থান তৈরি হয়েছে। এভারেস্ট জয় করেছে নারী। নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আজ একথা বলার আর উপায় নেই যে, নারীদের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ছোট হবার কারণে পুরুষের তুলনায় তাদের বুদ্ধি কম। এটা বিজ্ঞানে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সমাজে বৈষম্য যত কমবে, নারী-পুরুষের এই পার্থক্যও তত কমতে থাকবে।

এভাবেই কি চলতে থাকবে?

বহু বছর আগে নারীজাতির দুর্দশা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।’ সামন্ত সমাজে যে কষ্ট নিয়ে বিদ্যাসাগর একথাগুলো বলেছিলেন আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে তার তীব্রতা কতটুকু কমেছে? আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলে, ঘরে-বাইরে কোথাও নারী নিরাপদ নয়। সামাজিক বৈষম্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীর প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন তত বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং একটি সাম্যের সমাজ নির্মাণ করা ছাড়া এই গ্লানিকর অবস্থার বিলোপ ঘটবে না।কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কি আমরা নীরবে সবকিছু মেনে নেব? নারীও একজন স্বাধীন মানুষ, যার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী চলবার অধিকার আছে। ফলে আজ যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি, শত-সহস্র লাঞ্ছিতার আর্তচিৎকার যদি আমাদের বিবেকে এসে না বাজে মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয়ই বা থাকে কি? সমস্ত বড় মানুষেরা মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাকে অন্তরে ধারণ করে বড় হয়েছেন, স্বেচ্ছায় সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে ‘ধর্ষকের কোনো রাজনৈতিক দল নেই, পরিচয় নেই’ বলে যে কথা শোনা যায় এটা বিভ্রান্তি তৈরি কৌশলমাত্র। বরং ক্ষমতাসীন দলই আজকের দিনে ধর্ষক তৈরির কারখানা। দুবৃত্তায়িত রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে দেখা/ দেখানোর সুযোগ নেই। একজন ব্যক্তি যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের অংশ তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত হয় রাজনীতি দ্বারা। সমাজ শোষিত ও শোষক এই দুই ভাগে বিভক্ত। তাই দুই শ্রেণীর আদর্শও ভিন্ন। ফলে শোষকশ্রেণীর যে রাজনৈতিক আদর্শ – সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে – যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারও ভিত্তি – সেই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিকে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করছে। স্বার্থের কারণে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বুর্জোয়া রাজনীতির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে – এই রাজনীতি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করছে, ধর্ষক হিসেবে তৈরি করছে। আর শোষিত মানুষের রাজনীতি – যা যুগ যুগ ধরে সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তুলেছেন যে মহান মনীষীরা – তাদের উত্তরসূরি হিসেবে ব্যক্তিস্বার্থকে বাদ দিয়ে সমস্ত নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে শেখায়। সামাজিক স্বার্থকে ধারণ করে বলে তাদের চরিত্রের একটা মান, একটা মাধুর্য গড়ে উঠে। নারীকে মানুষ হিসাবে দেখার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে।

তাই এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের জন্য, নারীর সত্যিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এই শোষণমূলক সমাজকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। মানব ইতিহাসে এই ঘটনা ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এবং মানবসভ্যতা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল এর রূপ কেমন হতে পারে। নারীধর্ষণ, সামাজিক অপরাধের হার শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছিল। দেহ বিক্রি করে যারা পেট চালাতো, সেই নারীদের পুনর্বাসন করা হয়েছেল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল নারীব্যবসায়ী চক্র। নারীরা শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে, জ্ঞান-

বিজ্ঞান চর্চায়, খেলাধুলায় এমনকি দেশরক্ষায় কতটা অগ্রসর ও পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল – তার উদাহরণ মহাকাশে প্রথম প্রেরিত মানুষ ছিলেন একজন সোভিয়েত নারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। চীনে হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে নিষ্পেষিত নারীসমাজকে মুক্তি এনে দিয়েছিল বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ।

কোন মানুষই ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। এই বৈষম্যের সমাজ তাকে ধর্ষকে রূপান্তরিত করে, তার টিকে থাকার স্বার্থেই করে। ফলে এই বেদনা, এই কষ্ট, এই ক্ষোভের জলোচ্ছাসকে সমাজ ভাঙার জন্য কূল ছাপিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে হবে। না হলে বারবার একই চিত্র আমাদের অশ্রুভেজা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে হবে।